এডেলেইডে সাতদিন

প্রদীপ দেব

০৩

ইউনিভার্সিটি অব এডেলেইডের সবচেয়ে বড় অডিটোরিয়াম বনিথন হল। এই হলেই কনফারেনসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। সকাল সোয়া আটটার ভেতর হলের সামনে এসে গেছি। আস্তে আস্তে এসে পড়ছে সবাই। যার সাথে চোখাচোখি হচ্ছে সে-ই মৃদুভাবে 'হাই' বলছে বা মিষ্টি করে হাসছে। অস্ট্রেলিয়ানদের এই মিশুকে স্বভাব বিশ্ববিদিত। প্রাচীন এই হলটিতে বারো শ' মানুষ বসতে পারে একসাথে। হলের বাইরের দেয়াল পুরোনো কালের সাক্ষীস্বরূপ হলুদাভ পাথরের তৈরি। ভেতরটা কারুকার্যময়। সোনালী রঙের নানারকম নকশা ছাদ পর্যন্ত বিস্তৃত।

মেঝেতে সারি সারি কাঠের চেয়ার পাতা। দেখলে মনে হয় ভাড়া করে আনা হয়েছে এগুলো। একদিকে স্টেজ। স্টেজটা খোলামেলা, কিন্তু হলের তুলনায় বেশ ছোট। দু'পাশের দেয়ালে এডেলেইড ইউনিভার্সিটির প্রাক্তন চ্যান্সেলরদের বড় বড় তৈলচিত্র। এঁরা সবাই সাউথ অস্ট্রেলিয়ার প্রধান বিচারপতি ছিলেন। এডেলেইড ইউনিভার্সিটির নিয়ম অনুযায়ী সাউথ অস্ট্রেলিয়ার প্রধান বিচারপতিই পদাধিকার বলে ইউনিভার্সিটির চ্যান্সেলর হয়ে থাকেন। হলটা বাইরে থেকে দেখতে যতটা সুন্দর লাগে, ভেতরে ঢোকার পরে হলের সীমাবদ্ধতা দেখে ততোটাই হতাশ হলাম। কারণ হলটাতে শব্দ, আলো, তাপ এই অতি প্রয়োজনীয় তিনটি বিষয়ের কোনটার ওপরই কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। শহরের একটি প্রধান সড়কের ঠিক পাশে হওয়াতে গাড়ি চলাচলের শব্দ সরাসরি হলের ভেতর চলে আসে। অস্ট্রেলিয়ার কোথাও গাড়ির হর্ণ সাধারণত কেউ বাজায় না বলে কিছুটা রক্ষা। সূর্যালোক হলের জানালা ভেদ করে সরাসরি হলে ঢুকে পড়ছে। জানালায় ভারী পর্দার ব্যবস্থা আছে, কিন্তু তাতে তেমন কাজ হচ্ছেনা। মেলবোর্ন ইউনিভার্সিটির আধুনিক অডিটরিয়াম গুলোর সাথে পরিচয় না থাকলে এই বনিথন হলটাকেই একটা সুপারহল বলে মনে হতো।

মঞ্চের কাছাকাছি গিয়ে একটা চেয়ার দখল করে বসলাম। আস্তে আস্তে হল ভরে যাচ্ছে নানাজায়গা থেকে আসা ছোট বড় ফিজিসিস্টে। সকাল সাড়ে আটটা থেকে সাড়ে দশটা পর্যন্ত উদ্বোধনী সেশানের সভাপতি প্রফেসর টনি থমাস। এডেলেইড ইউনিভার্সিটির থিওরেটিক্যাল ফিজিক্সের জাঁদরেল প্রফেসর। গড়পড়তা অস্ট্রেলিয়ানদের উচ্চতার সাথে তুলনা করলে তাঁকে বেঁটে বলা যায়। তাঁর গোলগাল মুখটা দেখলে মনে হয় এখনো ছেলেমানুষ। এই মানুষটা সাব-এটমিক ফিজিক্সের একজন দিকপাল। এবছর হ্যারি ম্যাসে পুরস্কার পেয়েছেন থিওরেটিক্যাল ফিজিক্সের গবেষণায় অনন্য অবদান রাখার জন্য।

ঘড়ির কাঁটার প্রতি সম্মান দেখানো এখানে নৈতিক কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। ঠিক সাড়ে আটটায় সূচনা বক্তৃতা দিলেন অস্ট্রেলিয়ান ইনস্টিটিউট অব ফিজিক্স এর প্রেসিডেন্ট প্রফেসর জন

পিলব্রাউ। ভদ্রলোকের স্মার্টনেস দেখার মতো। দশমিনিটের ছোট্ট নিটোল ভাষণ। আটটা দশ মিনিটে ওয়েল-কাম স্পীচ দিলেন ডি-এস-টি-ও'র ডিরেক্টর মিস্টার নেইল ব্রায়ানস। গোঁফ বিহীন দাড়িতে ভদ্রলোককে দেখতে একটুখানি আব্রাহাম লিঙ্কনের মতো লাগে। ডি-এস-টি-ও হলো অস্ট্রেলিয়ান ডিফেনস সায়েনস এন্ড টেকনোলজি অর্গানাইজেশান; অস্ট্রেলিয়ার প্রতিরক্ষা বিভাগের গবেষণা প্রতিষ্ঠান। কেনের প্রাক্তন ছাত্র ডক্টর পিটার ডরটস্ম্যান এখন ডি-এস-টি-ও'র লেফটেনেন্ট কর্নেল। ডি-এস-টি-ও এই কনফারেনসের প্রধান স্পনসর।

মিস্টার নেইলের ভাষণের পরেই ঘোষণা মতো দাঁড়িয়ে গেলো সবাই। বেজে উঠলো অস্ট্রেলিয়ান জাতীয় সংগীতের সুর। হলে প্রবেশ করলেন সাউথ অস্ট্রেলিয়ার গভর্নর স্যার এরিখ নীল। তিনি এসে বসলেন না কোথাও। সরাসরি ডায়াসে চলে গেলেন। কনফারেনসের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ঘোষণা করলেন তিনি। তাঁর ভাষণ খুব সুন্দর বা বলা উচিত তাঁর যে সহকারী এই ভাষণটি রচনা করেছেন তিনি খুব খেটেখুটে তৈরি করেছেন এটা। বিজ্ঞানের ছাত্র নন বলে দুঃখ প্রকাশ করলেন গভর্নর। কিন্তু তিনি যে সমস্ত তথ্য দিলেন সাউথ অস্ট্রেলিয়া সম্পর্কে তা আসলেই যুগান্তকারী।

১৮৩৯ সালে এডেলেইড শহরের গোড়াপত্তন হয়। অবশ্য তার আগে থেকেই প্রস্তুতি চলছিলো এই সাউথ অস্ট্রেলিয়ান স্টেট প্রতিষ্ঠার। সাউথ অস্ট্রেলিয়া হলো অস্ট্রেলিয়ার একমাত্র স্টেট যেখানে কোন ধরনের কয়েদীকে এনে রাখা হয়নি বৃটেন থেকে। ১৮৩৪ সালে সাউথ অস্ট্রেলিয়া অ্যাক্ট বা ফাউন্ডেশন অ্যাক্ট পাস হয়। সেখানে পরিষ্কার করে উল্লেখ করা হয় যে এই অঞ্চলে কোন ধরনের সাজা প্রাপ্ত আসামীকে এনে রাখা হবে না। সে হিসেবে বলা চলে সাউথ অস্ট্রেলিয়ার আদি অভিবাসীরা অপরাধী ছিলেন না। অস্ট্রেলিয়ান আদিবাসীদের এবোরিজিনাল বলা হয়। তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলার সমস্ত চেষ্টা সত্ত্বেও তাদের অংশবিশেষ যখন তখনো বেঁচে আছে তখন তাদের অধিকার সংরক্ষণের ব্যাপারে প্রথমেই এগিয়ে এলো সাউথ অস্ট্রেলিয়া। ১৮৩৬ সালে আদিবাসীদের অধিকার সংরক্ষণের ব্যাপারে আইন পাস করা হয় এখানে। ১৮৩৭ সালে সাউথ অস্ট্রেলিয়াতেই প্রতিষ্ঠিত হয় অস্ট্রেলিয়ার প্রথম সুপ্রিম কোর্ট। এর ধারাবাহিকতায় পরের বছর এখানেই গঠিত হয় অস্ট্রেলিয়ার প্রথম পুলিশ ফোর্স। ১৮৪০ সালে অস্ট্রেলিয়ার প্রথম স্থানীয় প্রশাসন ব্যবস্থা গঠিত হয় সাউথ অস্ট্রেলিয়ায় আর তখন থেকেই শুরু হয় সরাসরি নির্বাচন প্রথা। অস্ট্রেলিয়াকে আধুনিক অস্ট্রেলিয়ায় পরিণত করার পেছনে যত ধরণের আধুনিক ব্যবস্থার প্রচলন করা হয়েছে তার বেশির ভাগই শুরু হয়েছে সাউথ অস্ট্রেলিয়া থেকে। আদিবাসীদের দেয়া কোন ধরণের সাক্ষ্য আদালতে গ্রহণ করা হতো না অস্ট্রেলিয়ায়। এই অমানবিক ব্যবস্থা বিলোপ করতে এগিয়ে এলো সাউথ অস্ট্রেলিয়া। ১৮৪৪ সালে আইন পাস করে আদিবাসীদের সাক্ষ্য দেবার অধিকার ফিরিয়ে দেয়া হলো। ধর্মের সাথে রাষ্ট্রক্ষমতার একটা সংযোগ অনেক দিন থেকেই আছে। কিন্তু এই সংযোগ থাকার দরুণ চার্চের অন্যায় রকম ভাবে রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থায় নাক গলানো বন্ধ করা যাচ্ছিলো না। কাজটা কঠিন, কিন্তু এই কঠিন কাজটা করার সাহস দেখালো সাউথ অস্ট্রেলিয়ার মানুষ। ১৮৫১ সালে এক যুগান্তকারী আইন পাস হয়, বৃটিশ রাজত্বে এধরনের আইন এই প্রথম। রাষ্ট্র আর চার্চের মধ্যে সংযোগ কেটে দেয়া হয়। চার্চের আর কোন ক্ষমতা থাকলো না রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থায় নাক গলানোর।

ধনী আর দরিদ্রের বৈষম্য সর্বকালীন। সেসময় অস্ট্রেলিয়ায় নির্বাচন প্রথা চালু থাকলেও দেখা গেলো যাদের জমি আছে তারাই কেবল ভোট দিতে পারেন। আবার যাদের বিভিন্ন নির্বাচনী এলাকায় জমি আছে তারা বিভিন্ন এলাকায় একাধিক ভোট দেবার অধিকারী হচ্ছে। এ ব্যবস্থা বৈষম্যমূলক। ১৮৫৬ সালে সাউথ অস্ট্রেলিয়াতেই প্রথম চালু করা হয় ''এক জনের এক ভোট'' ব্যবস্থা। সাউথ অস্ট্রেলিয়াই হলো অস্ট্রেলিয়ার প্রথম স্টেট যেখান থেকে আধুনিক নির্বাচন পদ্ধতি, গোপন ব্যালট সিস্টেম চালু করা হয়। তাছাড়া তিন বছর মেয়াদী পার্লামেন্টের ব্যবস্থাটাও সাউথ অস্ট্রেলিয়া থেকেই শুরু হয়। সবার জন্য শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করতে এগিয়ে এলো সাউথ অস্ট্রেলিয়া। ১৮৭৫ সালে সাত থেকে তেরো বছরের ছেলেমেয়েদের জন্য স্কুল শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়। পরে ১৯১৫ সালে বয়সের সীমা এক বছর বাড়িয়ে সাত থেকে চৌদ্দ করা হয়। ১৮৭৬ সালে বৃটিশ রাজত্বে প্রথম বারের মতো ট্রেড ইউনিয়ন করাটাকে আইনসিদ্ধ করা হয় সাউথ অস্ট্রেলিয়ায়।

মেয়েদের প্রতি বৈষম্য দূর করার জন্য সাউথ অস্ট্রেলিয়ার ভূমিকা অসীম। মেয়েদের ভোট দেবার অধিকার প্রদান করার ব্যাপারে এগিয়ে আসে সাউথ অস্ট্রেলিয়া। একেবারে সব মেয়েদের জন্যই ভোটের অধিকার প্রদান সম্ভব না হলেও ধাপে ধাপে অগ্রসর হয়েছে সেই ব্যবস্থার দিকে। ১৮৭৬ সালে সম্পদশালী মহিলাদের ভোটাধিকার দেয়া হয়। তখনো মেয়েরা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার অধিকার পায়নি। তারজন্য অপেক্ষা করতে হয়েছে আরো বিশ বছর। ১৮৯৬ সালে সব প্রাপ্তবয়স্ক মহিলারাই ভোট দেবার অধিকার পায়। পরের বছর থেকেই তারা নির্বাচনে প্রার্থী হবার অধিকার পায়। অথচ আমেরিকায় মেয়েরা ভোটাধিকার পেয়েছে আরো অনেক পরে ১৯২০ সালে। ক্যাথেরিন হেলেন স্পেনস হলেন অস্ট্রেলিয়ার প্রথম মহিলা যিনি ভোটে রাজনৈতিক প্রার্থী হয়েছিলেন সাউথ অস্ট্রেলিয়ায় ১৮৯৭ সালে।

মেয়েদের শিক্ষার জন্য সাউথ অস্ট্রেলিয়ার অবদান অপরিসীম। ১৮৭৯ সালে এখানেই প্রতিষ্ঠিত হয় মেয়েদের জন্য অস্ট্রেলিয়ার প্রথম মাধ্যমিক স্কুল। ইউনিভার্সিটি অব এডেলেইড হলো অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইউনিভার্সিটি যেখানে মেয়েদের পড়াশুনার সুযোগ দেয়া হয়। অস্ট্রেলিয়ার প্রথম মহিলা স্নাতক হলেন এডিথ ডর্নওয়েল। ইউনিভার্সিটি অব এডেলেইড থেকে বি-এস-সি ডিগ্রি লাভ করেন তিনি ১৮৮০ সালে। ১৯১৫ সালে এই এডেলেইডেই প্রথম বারের মতো মহিলা পুলিশ নিয়োগ করা হয় পুরুষদের সমান দায়িত্বে আর সমান বেতনে।

সাউথ অস্ট্রেলিয়ার মেয়ে ডেইম রোমা মিশেল অস্ট্রেলিয়ান মেয়েদের জন্য একজন আইকন। ১৯৬২ সালে তিনি মহারানীর প্রথম মহিলা কাউনসেল নিযুক্ত হন। ১৯৬৫ সালে তিনি সুপ্রিম কোর্টের বিচারক পদে নিয়োগ পান। অস্ট্রেলিয়ার ইতিহাসে প্রথম মহিলা বিচারক। ১৯৮৩ সালে সাউথ অস্ট্রেলিয়ার প্রধান বিচারপতি হন তিনি আর পদাধিকার বলে এডেলেইড ইউনিভার্সিটির চ্যান্সেলর। অস্ট্রেলিয়ার প্রথম মহিলা প্রধান বিচারপতি আর চ্যান্সেলর। শুনতে শুনতে চোখ চলে গেলো ডান পাশের দেয়ালে। সেখানে অন্য সব চ্যান্সেলরের সাথে রোমা মিশেলের তৈলচিত্রও রাখা আছে। ১৯৯১ সালে মিশেল স্টেট গভর্নর নিযুক্ত হন। তাঁর

আগে আর কোন মহিলা এই পদে আসীন হননি। ধন্য সাউথ অস্ট্রেলিয়া।

আদিবাসীরা পিছিয়ে আছে সবদিক থেকে। সেক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হলেন স্যার পিটার ডগলাস নিকোলস। আদিবাসী সমাজের স্যার ডগলাস সাউথ অস্ট্রেলিয়ার প্রধান বিচারপতি হয়েছিলেন এবং এডেলেইড ইউনিভার্সিটির চ্যান্সেলর। ১৯৭৬ সালে তিনি স্টেট গভর্নর হয়েছিলেন। সাউথ অস্ট্রেলিয়ার ইতিহাস শুনতে শুনতে মনে হচ্ছিলো একটা বৈপ্লবিক স্থানে এসেছি আজ। একটি জাতি গঠনে এই দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার গুরুত্ব অসীম। দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার বীয়ার নাকি পৃথিবী বিখ্যাত। এই বীয়ার পান করার আমন্ত্রণ জানিয়ে ভাষণ শেষ করলেন গভর্নর। ভাষণ শেষ করে তিনি আর বসলেন না। জাতীয় সংগীতের সুরের সাথে পা ফেলে চলে গেলেন হলের বাইরে। গভর্নরের পদ সাংবিধানিক পদ, আর ক্ষমতাও আঁচ করা যায় যেখানে জাতীয় সংগীতের সাথে তাঁর আসা যাওয়া।

সকাল ন'টায় শুরু হলো প্রথম প্লেনারী সেশান। কেমব্রীজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর জন ব্যারো বিশ্বব্রহ্মান্ডের উৎস সম্পর্কে বললেন পঁয়তাল্লিশ মিনিট। প্রফেসর জন ব্যারো পৃথিবী বিখ্যাত ব্যক্তি। কস্‌মোলজি বিষয়ে তাঁর বেশ কিছু বই আছে। ''থিওরী অব এভরিথিং'', ''ইম্পসিবিলিটি'', ''বিটুইন ইনার স্পেস এন্ড আউটার স্পেস'', ''দি অরিজিন অব দ্যা ইউনিভার্স'', ''দি বুক অব নাথিং'' ইত্যাদি বিখ্যাত সব বইয়ের লেখক তিনি। বাংলাদেশে থাকতে বৃটিশ কাউন্‌সিলে তাঁর ''থিওরী অব এভ্‌রিথিং'' বইটার পাতা উলটে দেখেছিলাম। তখন ভাবিনি যে একদিন এই মানুষের সামনে বসে কথা শোনার সুযোগ পাবো। এখন জন ব্যারোর বক্তৃতা শুনছি মাত্র কয়েক হাত দূরে বসে, ভাবতেই বেশ গর্ব অনুভব করছি।

প্রথম অধিবেশনের শেষ লেকচার দিলেন ডক্টর মাইক কেলি। আমেরিকার কর্নেল ইউনিভার্সিটির প্রফেসর। হলের ভেতর প্রচন্ড গরম। শব্দ অনিয়ন্ত্রিত। ভালো লাগছে না আর। মঞ্চের এতটা সামনে এসে বসাতে বের হয়ে যেতেও পারছিনা। আশে পাশে তাকাচ্ছি। আমার সামনের সারিতে বসা একটা মোটা মেয়ে সেলাই কাজ শুরু করেছে। বৈজ্ঞানিক সম্মেলনে বিখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানীর বক্তৃতা শুনতে শুনতে সেলাই করার কথা আমি ভাবতেও পারিনা। কিন্তু বেশ দক্ষতায় হাত চলছে মেয়েটার। ডক্টর কেলি নিশ্চয় দেখছেন মেয়েটা কী করছে। কেমন লাগছে প্রফেসর কেলির? তাঁর ক্লাসে কোন ছাত্র বা ছাত্রী এরকম করলে তিনি নিশ্চয় ক্লাস থেকে বের করে দিতেন তাকে। পেছনে তাকিয়ে দেখলাম অনেকে বেশ উৎকর্ণ হয়ে শুনছে প্রফেসরের লেকচার। আবার কেউ কেউ কনফারেনস হ্যান্ডবুক বের করে তার পাতা ওলটাচ্ছে।

প্লেনারী সেশানের মূল থীম হওয়া উচিত ফিজিক্সের সব শাখার উপযোগী। কিছুটা কমন প্রোবলেম বিষয়ক বা পপুলার সায়েন্স টাইপ। আমার প্ল্যান ছিলো প্লেনারী সেশানের সবগুলো লেকচার শুনবো। এখন সে প্ল্যান বাতিল করতে হলো। যে লেকচার আমি উপভোগ বা হজম করতে পারবো না সেখানে এসে বসে থাকার মানে হয়না। বুঝতে পারছি এজন্যই কেন্ বলেন, একসাথে সব বিষয়ে জানতে চাইলে কোন বিষয়ই ভালো করে জানতে পারবে না।

সকাল সাড়ে দশটা থেকে এগারোটা পর্যন্ত চা বিরতি। ইউনিয়ন হাউজের প্রথম, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ তলায় চা, কফি, বিস্কুট রাখা আছে। সাত আটশ মানুষের জন্য সুবিন্যস্ত ব্যবস্থা। লাইন ধরে দাঁড়িয়ে কফি বা চা বানিয়ে নাও, চা-বিস্কুট নিয়ে বসে পড়ো গাছের ছায়ায়, ঘরের ভেতর, বাইরের রোদে যেখানে খুশি। চারতলায় বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির প্রদর্শনী চলছে। চায়ের কাপ হাতে ঘুরে ঘুরে সেসব দেখা যায়। খাবার শেষে কাপ ডিস ঘরের ভেতর নির্দিষ্ট জায়গায় রেখে এলেই হলো। উচ্ছিষ্ট টুকু বীনে ফেলে দেয়ার জন্য অনেক বীন রাখা আছে আশে পাশে। যার কাজ সে করছে। কোথাও কোন সমস্যা নেই, জটলা নেই। এক্সট্রা কোন লোকেরও দরকার হচ্ছে না তেমন। কালো কফি আর একমুঠো বিস্কুট নিয়ে ইউনিয়ন হাউজের পাশের বারান্দায় বেরুতেই সমস্বরে আহবান,
- হাই প্রাডিব, কাম হিয়ার।
দেখলাম জন, এরিখ আর ট্যান বসে বসে চা খাচ্ছে চারজনের একটা টেবিলে। আমি এগিয়ে গেলাম। জন লী আর ট্যাং ল্যাং দুজনেই চায়নিজ। জন এখন অস্ট্রেলিয়ার নাগরিক। মেলবোর্নে আমাদের স্কুলেই অপটিক্স গ্রুপে পি-এইচ-ডি করছে। তাকে দেখে বোঝা যায় না যে তার একটা আঠারো বছরের মেয়ে আছে। ডক্টর ট্যান ল্যাং বেইজিং বিশ্ববিদ্যালয়ের এসোসিয়েট প্রফেসর। কিন্তু তাঁকে দেখতে মনে হয় বাইশ তেইশ বছরের দুরন্ত মেয়ে। তিনি এখন মেলবোর্ন ইউনিভার্সিটিতে অপটিক্স গ্রুপে পোস্টডক্টরেট করছেন। এরিখ এম্পেম লেসেন ঘানার ছেলে। সেও মেলবোর্নের অপ্টিকস গ্রুপের পি-এইচ-ডি স্টুডেন্ট। পারস্পরিক খোঁজ খবর নিলাম। এরিখ উঠেছে মেলবোর্ন স্ট্রিটের একটি বাসায়। এডেলেইডে এসেও মেলবোর্নের মায়া কাটাতে পারছে না বলে কিছুক্ষণ ঠাট্টা তামাশা করলাম সবাই মিলে। বাসার ব্যবস্থা নাকি অতি চমৎকার। এয়ারকন্ডিশনার, ফ্রিজ, মাইক্রোওভেন যেখানে যা লাগে। এরিখ খুব খুশি এসমস্ত উপাদান পেয়ে।

প্লেনারি সেশানে আমি আর যাচ্ছি না শুনে এরাও আর না যাবার সিদ্ধান্ত নিলো। আড্ডা জমে উঠলো। কীভাবে যেন সাম্প্রদায়িকতা, বর্ণবাদ এসমস্ত বিষয় চলে এলো আলোচনায়। আসলে সবাই বিদেশী হলে সম্ভবত এসমস্ত বিষয়ে মন খুলে কথা বলা যায়। বর্ণবাদ বিষয়ে এরিখের অভিজ্ঞতা আমাদের সবার চেয়ে বেশি। সে বললো,
- বর্ণবাদ তো তোমরা কিছুই দেখোনি। দেখেছি আমি, আমরা, আফ্রিকান কালোরা।

সে যা বললো তার কিছু কিছু আমারও চোখে পড়েছে মেলবোর্নে। মালটিকালচারালিজমে মেলবোর্ন এগিয়ে আছে অস্ট্রেলিয়ার অন্যান্য স্টেট থেকে। এই মেলবোর্নেও আমি দেখেছি ট্রামে বা ট্রেনে কালো মানুষদের পাশে কোন সাদা অস্ট্রেলিয়ান বসতে চায় না। বিশেষ করে কোন বুড়ো অস্ট্রেলিয়ান। আর কোন কালোমানুষকে পাশে বসতে দেয়ার তো কোন প্রশ্নই ওঠেনা। এরিখ বলছে,
- আমার তো সুবিধাই তাতে। আমার পাশে কেউ ভিড় করেনা, আমাকে ধাক্কা খেতে হয়না। আবার পাশে কেউ না বসলে আরামে দুটো সিট নিয়ে বসে যেতে পারি আমি।

আমি বুঝতে চেষ্টা করছি এরিখের ভেতরের যন্ত্রণাটা। অন্যের নীরব অবহেলা যে মানুষকে

কেমন কষ্ট দেয় তা কিছুটা হলেও তো বুঝি আমি। এরিখ আরো যা জানালো তা আমার কাছেও নতুন।
- ঘানায় আমার নিজের দেশেও আমরা কালোরা অবহেলিত তা জানো? আমার নিজের দেশের কালো ট্যাক্সিওয়ালারা কালোদের নামিয়ে দিয়ে সাদাদের সামনের সিটে বসতে দেয়। ভেতরে ভেতরে আমরা এখনো ক্রীতদাস রয়ে গেছি।

এরিখের ছোট ছোট চোখদু'টি টকটকে লাল। স্বাভাবিক ভাবেই হয়তো লাল থাকে সে দু'টো। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে সেখানে আগুন জ্বলছে। মনে পড়ছে ''রুট্স'' এর কুন্টা কিন্টের কথা। এরিখের মনটা আর খারাপ হতে দিলাম না। বললাম,
- চলো ঘুরতে যাই।
ট্যান আর জন তৎক্ষনাৎ রাজী। কিন্তু এরিখ রাজী হলো না। সে বাসায় চলে যাবে। কারণ পরদিন তার টক্। আমার নিজের বক্তৃতা কনফারেনসের শেষের দিন। সুতরাং আমি এখনো রিলাক্সড।

ভিক্টোরিয়া ড্রাইভ পার হলেই টরেন্স নদী। তার উপর ফুট ব্রীজ। লোহার রেলিং ধরে দাঁড়ালে নিচের স্বচ্ছ পানিতে প্রতিবিম্ব দেখা যায়। ছোট্ট নদী, তিরতির করে বয়ে চলেছে শান্ত স্রোত। মনে হচ্ছে পাহাড় ধোয়া জল। নদীর পাড়ে যত্নে বর্ধিত ফুলের বাগান। জনের ছবি তোলার শখটা বাতিকের পর্যায়ে পড়ে। যা-ই দেখে তার পাশে দাঁড়িয়েই ছবি তুলতে চায়। পার্কে রাখা একটা ডাস্টবিনের পাশে দাঁড়িয়েও একটা ছবি তোলা হয়ে গেছে তার। ক্যামেরা নিয়ে তার পিছু পিছু অনেক ঘুরতে হলো, অনেক ছবি তুলে দিতে হলো।

নদীর ওপাড়ে সুন্দর সবুজ ঘাস, ফুলের বাগান, পার্ক। অদ্ভুত সুন্দর। নদীর দুপাড়ে ফুলের গাছ, নানারকম ফুল ফুটে আছে সেখানে। হাঁটতে হাঁটতে এডেলেইড ওভালের কাছে চলে এলাম। এডেলেইডের ক্রিকেট স্টেডিয়াম, বিশ্ববিখ্যাত এডেলেইড ওভাল। শুক্রবার থেকে এখানে শুরু হচ্ছে অস্ট্রেলিয়া ওয়েস্ট ইন্ডিজ টেস্ট ক্রিকেট। এডেলেইড ওভালের পাশ দিয়ে চলে গেছে বিরাট রাস্তা। নদীর ওপর বিরাট ব্রীজ। এডেলেইড ফেস্টিভ্যাল সেন্টার ডানে রেখে রাস্তাটা সোজা গিয়ে মিলেছে মূল সিটিতে। এডেলেইড ফেস্টিভ্যাল সেন্টারটা চমৎকার। মেলবোর্ন আর্ট সেন্টারের মতো অতটা বড় নয় ঠিকই, তবে আকর্ষণীয়। বিশেষ করে নদীর ধারের ফুলের বাগানটা। এডেলেইডকে আগে বলা হতো ''সিটি অব চার্চ'', এখন বলা হয় ''ফেস্টিভ্যাল সিটি''। ফেস্টিভ্যাল সেন্টারের মুখোমুখি রাস্তার ওপারে গভর্নমেন্ট হাউজ। বাগানের পর বাগান দিয়ে ঘেরা। দেখতে দেখতে ফিরে এলাম ইউনিয়ন হাউজে। সাড়ে বারোটা থেকে দুটো পর্যন্ত লাঞ্চ।

লাঞ্চের ব্যবস্থাও চার জায়গায় করা আছে। যেরকম ভীড় হবে আশংকা করেছিলাম সেরকম কোন ভীড় হলো না। আটশ লোক লাঞ্চ করলো দেড় ঘন্টা সময়ের ভেতর। অথচ কোন বিশৃঙ্খলা বা কোলাহল বা ঠেলাঠেলি কিছুই হলো না। কয়েক রকম স্যান্ডুইচ, ফ্রুটস, সালাদ আর অরেন্জ জুস। যার যা খুশি যত খুশি নিয়ে নিয়ে খাও। কথা বলতে বলতে এরা যে কী পরিমাণে খেতে পারে তা না দেখলে বিশ্বাস করা যায়না। আমি একটা স্যান্ডুইচ শেষ করতে

যেখানে হিমসিম খাচ্ছি, সেখানে ক্ষুদ্রাকৃতির ট্যান পর্যন্ত আড়াইটা চিকেন স্যান্ডুইচ শেষ করে ফেলেছে।

দুপুর দুটো থেকে আটটি অধিবেশন একই সময়ে শুরু হলো আটটি অডিটরিয়ামে। যার যার পছন্দ মতো সেশানে গেলেই হলো। আমি নিউক্লিয়ার ও পার্টিক্যাল ফিজিক্সের সেশানে যোগ দিলাম। এই সেশান হচ্ছে ফিজিক্স বিল্ডিং এর কের গ্রান্ট অডিটরিয়ামে। এই অডিটরিয়ামটি দারুণ। শব্দ আলো তাপ নিয়ন্ত্রিত। প্রথম অধিবেশনের সভাপতি ডক্টর অ্যান্ড্রু সাছবেরী। অস্ট্রেলিয়ান ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির নিউক্লিয়ার ফিজিক্সের প্রফেসর আর নিউক্লিয়ার এন্ড পার্টিক্যাল ফিজিক্স সেকশানের আহবায়ক। প্রথম লেকচারটি দিলেন মেলবোর্ন ইউনিভার্সিটির এসোসিয়েট প্রফেসর মার্টিন সেভিয়ের। হাফপ্যান্ট আর টী-শার্ট পরে এসেছেন মার্টিন। বোঝা গেলো কনফারেনসে আর যাই হোক, পোশাক নিয়ে কেউ মাথা ঘামাচ্ছে না। এখানে তুমি কোন্ বৈজ্ঞানিক যুক্তিটা দেখাচ্ছো সেটাই বড় কথা, কী পোশাক পরে এসেছো হু কেয়ার্স? অস্ট্রেলিয়ার বাইরে থেকে যারা এসেছেন দেখা যাচ্ছে স্যুট পরে এসেছেন। আর ঘরের কাছের যারা, তারা আটপৌরে পোশাকে। অস্ট্রেলিয়ার সবখানেই এরকম ক্যাজুয়েল পোশাক চলে। পোশাক এখানে আলাদা করে কোন ওজন বাড়ায় না। শেখ সাদী এখানে এলে খুব খুশি হতেন নিশ্চয়।

ইয়াস্নাকে দেখে মনে হচ্ছে খুব নার্ভাস হয়ে পড়েছে। ইয়াস্না দ্রাগিগ। শ্রীলংকান নাম মনে হলেও সে অস্ট্রেলিয়ায় জন্মেছে। অস্ট্রেলিয়ানদের সাথে তার যতটা মিল শ্রীলংকানদের সাথে তার ততোটাই অমিল। এমনকি তার গায়ের রঙও সাদার কাছাকাছি। আমি তাকে যাস্না এবং মাঝে মাঝে জোছনা বলেও ডাকি। সে কিছু মনে করেনা। বেচারী ঘন ঘন পানি খাচ্ছে। অথচ আমি জানি একটু পরে যখন সে বক্তৃতা দিতে উঠবে সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে। আমার সামনের সিটে বসেছেন ডক্টর অঞ্জলি মুখার্জি। তাঁর পাশে মোটা অস্ট্রেলিয়ান মেয়েটি। এখানেও তার সুঁই চলছে সমানে। অঞ্জলি পেছন ফিরে দেখলেন আমাকে। আর আমাকে অবাক করে দিয়ে পরিচয় করিয়ে দিলেন পাশের মোটা মেয়েটার সাথে। নাম রাসেল বাট। রাসেল আমার দিকে তাকিয়ে মুখটা সামান্য হাসি হাসি করার চেষ্টা করলো, কিন্তু খুব বেশি গোল মুখে হয়তো সব অভিব্যাক্তি ভালোভাবে ফোটেনা। হাত বাড়ানোর নিয়ম থাকলেও রাসেল তার সুচিকর্ম একটুক্ষণের জন্যও থামানোর কোন লক্ষণ দেখালো না। ফলে পরিচয় পর্ব খুব একটা জমলো না।

নিউক্লিয়ার ফিজিক্সের বেশির ভাগ বক্তৃতাই দেখা যাচ্ছে হয় এক্সপেরিমেন্টাল নয়তো হাই এনার্জি ফিজিক্সের থিওরী। আমি যে ফিল্ডে কাজ করছি, নিউক্লিয়ন- নিউক্লিয়াস, খুব একটা নেই। ধরতে গেলে আমি একা এই ফিল্ডে। কারণ আমার কাজের জন্য যেধরণের রি-অ্যাক্টর দরকার সেধরণের রি-অ্যাক্টর এখনো নেই অস্ট্রেলিয়ায়। আমরা ডাটার জন্য নির্ভর করি আমেরিকা, জাপান, জার্মানী বা ফ্রান্সের উপর। পাঁচটায় অধিবেশন শেষ হলো।

সন্ধ্যা সাতটায় নিউক্লিয়ার ফিজিক্সের রিসেপশান ইউনিয়ন বিল্ডিং এর ছয়তলায়। এই রিসেপশানের অর্থ হলো খাদ্য ও পানীয়ের বিপুল সরবরাহ ও লাগামহীন আড্ডা। মেলবোর্ন

গ্রুপের সাথে আড্ডা দিতে দিতে প্রায় সাড়ে আটটা বাজলো। র‍্যাছেল, ম্যাট, ক্রেগ সবাই মিলে ইয়াস্‌নার ''ফ্রি'' হয়ে যাওয়া সেলিব্রেট করছে। বক্তৃতা শেষ হয়ে যাওয়া মানে মুক্ত পাখি। বীয়ারের বোতল সবার হাতে। আমার অবস্থা দশচক্রে ভগবান ভূতের মতো। টয়লেটের নাম করে সোজা নিচে চলে এলাম। অর্থহীন হৈ চৈ আমিও কম করিনা। কিন্তু এখন কেমন যেন ভালো লাগছিলো না।

টরেন্‌স নদীর পাড় ধরে হাঁটতে লাগলাম একা একা। নির্জন পথ। চলে গেছে ক্রমশ গভীর অরণ্যের দিকে। আমি হাঁটছি। জঙ্গাল যে এত সুন্দর তা অনেক দিন পরে দেখলাম আবার। সূর্য ডোবার আগে যেটুকু লাল ঢেলে দেয় তার সবটুকুই যেন ছড়িয়ে পড়েছে গাছের মাথায় মাথায় পাতায় পাতায়। বিভূতিভূষণের কথা মনে পড়ছে আমার। আচ্ছা অস্ট্রেলিয়ান দের কি বিভূতিভূষণ আছে? আছে হয়তো। এমন অরণ্য যেখানে আছে সেখানে একজনও কি বিভূতিভূষণ তৈরি হয়নি? প্রচুর পাখি দেখা যাচ্ছে। নানা রঙের পাখি, নানা সুরে ডাক দেয়া পাখি। বায়নোকুলার দিয়ে কিছুক্ষণ পাখি দেখলাম। এতপাখি এখানে এলো কোত্থেকে? ক্রমশ আঁধার নেমে এলো। আঁধারের একটা সীমানা পর্যন্ত আমাদের চোখ যায়, তারপরে আঁধারকে ভালো লাগার পরিবর্তে ভয় লাগে। ফিরে আসার পথ ধরলাম।

হোস্টেলে ঢোকার মুখে জিনকে দেখলাম লবীতে বসে আছে চুপচাপ। আমাকে দেখে হাই বললো। আমিও ''হাই'' বলে দ্রুত লিফ্‌টে উঠে গেলাম। লিফ্‌ট ওপরে ওঠতে শুরু করার পরে হঠাৎ হাসি পেয়ে গেলো। জিনকে আমি এড়িয়ে চলতে চাইছি কেন? নইলে লিফ্‌টে ওঠার জন্য এতটা ব্যস্ততা দেখানোর কোন দরকার ছিলো কি?